চল্লিশ বছরের পূর্তি উৎসব

চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটি

১৯৭৩ - ২০১৩

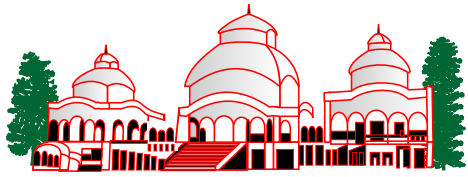

দেবীতীর্থে প্রথম ভাগ

(১৯৭৩ - ১৯৯৮)

দেবীতীর্থে দ্বিতীয় ভাগ

(১৯৯৮ - ২০১৩)

সংকলণ - বিশ্বপতি ঘোষ

ডাঃ আনন্দ মুখার্জী

শ্রীমতি তাপসী বিশ্বাস

চিত্রগ্রহণে - কুমারী প্রভা মজুমদার

MANAGING COMMITTEE 2013 - 2015

SITTING FIRST ROW FROM LEFT	ALOKE KUMAR MUKHERJEE, AJAY KUMAR TALAPATRA, BASUDEV GUHA, MANOJ CHATTERJEE, MANJU MOITRA, PRABHA MAJUMDAR, ANITA HALDAR, ASHISH DUTTA, PRADIP KUMAR BANERJEE, ANJAN MUKHERJEE, VIVEK GUHA THAKURTA.
SITTING SECOND ROW FROM LEFT	NARAYAN DEY, BINAY BASU, BHABESH CHANDRA BHATTACHARYYA, MONICA BASU, N. N. SARKAR, ANANDA MUKHERJEE, SANTI MAZUMDER, PRADIP MAJUMDAR, ASHOK MUKHERJEE, SUBHANKAR CHATTERJEE, SUJIT KUMAR CHATTOPADHYAY, A. K. CHANDA.
STANDING THIRD ROW	PRAMITABHA BARUA, GAUTAM KANJILAL, JAYANTA MUKHERJEE, SUBRATA KISHORE MAJUMDAR, S. B. BOSE, SUGANDHA BANIK, S. N. GHOSH DASTIDAR, CHANCHAL GHOSH, CHAMPAK SEN, SAMBHU BAGCHI.

MANAGING COMMITTEE 2013 - 2015 (CONTD.)

SITTING FIRST ROW FROM LEFT	PIJUSH KR. BHATTACHARJEE, PHANI B. MAJUMDAR, DIBYENDU BANERJEE, SABITA NATH, DEBOSREE ROY, SIKHA MAJUMDAR, AMAR SARKAR, AJOY BISWAS.
SITTING SECOND ROW FROM LEFT	P. K. BHATTACHARYA, S. K. GANGULI, R. K. ROY CHOWDHURY, BISWAPATI GHOSH, A. K. GHOSH, PARITOSH BANDOPADHYAY, JYOTIRMOY MITRA.

PRIESTS

SITTING FIRST ROW FROM LEFT	GURUPADA BATABYAL, JAGADISHWAR CHAKRABORTY, PUSHPAL BANERJEE, UMACHARAN MUKHERJEE, SUBRATA ROY.
SITTING SECOND ROW FROM LEFT	MUKTIPADA CHAKRABORTY, N. N. SARKAR, ANANDA MUKHERJEE, SANTI MAZUMDER, SAMAR KUMAR BHATTACHARYA, RANJIT PAHARI.

SEVAYATS

SITTING FIRST ROW FROM LEFT	LAKHAN SARDAR, NIRMAL GHARAMI, DIBAKAR BAIRAGI, SRIDHAR MIDDYA, AMIT CHAKRABORTY, ASHIM SARDAR, SUKESH HALDAR, KAMAL DAS, NITAI SIKARI, DILIP BISWAS, ASTIK DAS.
SITTING SECOND ROW FROM LEFT	BHOLA NATH PATRA, DRONACHARYA CHAKRABORTY, N. N. SARKAR, ANANDA MUKHERJEE, SANTI MAZUMDER, PURNIMA DEY, SUJIT MULLICK.

গত ১৫ বছরে, কালীমন্দিরের সভাপতি, সচিব ও কোষাধ্যক্ষদের পরিচিতি

১৯৯৯ - ২০০১	সভাপতি - শ্রী নৃত্যেন্দ্রনাথ সরকার সচিব - ডঃ আনন্দ মুখার্জী কোষাধ্যক্ষ - শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা
২০০১--২০০৩	সভাপতি - শ্রী নৃত্যেন্দ্রনাথ সরকার সচিব - ডঃ আনন্দ মুখার্জী কোষাধ্যক্ষ - শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা
২০০৩-২০০৫	সভাপতি - ডঃ আনন্দ মুখার্জী সচিব - শ্রী অনন্তবিজয় ভট্টাচার্য কোষাধ্যক্ষ - শ্রী অজয় তলাপাত্র
২০০৫--২০০৭	সভাপতি - ডঃ আনন্দ মুখার্জী সচিব - শ্রী অনন্তবিজয় ভট্টাচার্য্য কোষাধ্যক্ষ - শ্রী অজয় তলাপাত্র
২০০৭-২০০৯	সভাপতি - শ্রী অনন্তবিজয় ভট্টাচার্য্য সচিব - শ্রী প্রদীপ মজুমদার কোষাধ্যক্ষ - শ্রী শুভঙ্কর চ্যাটার্জী
২০০৯-২০১১	সভাপতি - ডঃ আনন্দ মুখার্জী সচিব - শ্রী প্রদীপ মজুমদার কোষাধ্যক্ষ - শ্রী অজয় তলাপাত্র
২০১১-২০১৩	সভাপতি - ডঃ আনন্দ মুখার্জী সচিব - শ্রী শান্তি মজুমদার কোষাধ্যক্ষ - শ্রী অজয় তলাপাত্র
২০১৩-২০১৫	সভাপতি - শ্রী নৃত্যেন্দ্র নাথ সরকার সচিব - শ্রী শান্তি মজুমদার কোষাধ্যক্ষ - শ্রী সুনীল কুমার পাল

কার্য্য নির্বাহক সমিতি ২০১৩–১৫

পৃষ্ঠ – পোষক গণ	–	শ্রী পার্থ ঘোষ
		শ্রী অরূপ রায়চৌধুরী
		শ্রী আর. কে. রায়চৌধুরী
		শ্রী আর. পি. ব্যানার্জী
		শ্রী পরিতোষ বন্দোপাধ্যায়
		প্রঃ সি. এন. চক্রবর্তী
		শ্রী এ. কে. ঘোষ
		শ্রী বিশ্বপতি ঘোষ
		শ্রী ভবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
		শ্রীমতি মনিকা বাসু
প্রধান উপদেষ্টা	–	ডঃ আনন্দ মুখার্জী
উপদেষ্টা গণ	–	শ্রী এস. কে. গাঙ্গুলী
		ডঃ এস. এস. চ্যাটার্জী
		কুমারী প্রভা মজুমদার
		শ্রী মনোজ চ্যাটার্জী
সভাপতি	–	শ্রী এন. এন. সরকার
সহ-সভাপতি গণ	–	শ্রী প্রদীপ মজুমদার
		শ্রী জ্যোর্তিময় মিত্র
		শ্রী শুভঙ্কর চ্যাটার্জী
		শ্রী গৌতম কাঞ্জিলাল
		শ্রী অশোক মুখার্জী
সচিব	–	শ্রী শান্তি মজুমদার
কোষাধ্যক্ষ	–	শ্রী সুনীল কুমার পাল
যুগ্ম সচিব গণ	–	শ্রী আশীষ দত্ত
		শ্রী পি. কে. ব্যানার্জী
		শ্রী অজয় কুমার তলাপাত্র
		শ্রী অঞ্জন মুখার্জী
		শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সদস্য / সদস্যা গণ	–	শ্রী অলোক কুমার মুখার্জী
		শ্রীমতি মঞ্জু মৈত্র
		শ্রী বিবেক গুহঠাকুরতা
		শ্রীমতি অনিতা হালদার
		শ্রীমতি শিখা মজুমদার
		শ্রী নারায়ণ দে
		শ্রী পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য
		শ্রী বাসুদেব গুহ
		শ্রী এস. এন. ঘোষদস্তিদার
		শ্রী শম্ভু ভদ্র
		শ্রী এস. কে. মজুমদার
		শ্রী এস. বি. বোস
		শ্রী শম্ভু বাগচি
		শ্রী চঞ্চল ঘোষ
		শ্রী প্রমিতাভ বড়ুয়া
		শ্রী চম্পক সেন
		শ্রী সুজিত চট্টোপাধ্যায়
বিশেষ অতিথি গণ	–	শ্রীমতি সবিতা নাথ
		শ্রীমতি দেবশ্রী রায়
		শ্রী সুগন্ধ বণিক
		শ্রী বিনয় বসু
		শ্রী ফনি ভূষণ মজুমদার
		শ্রী জয়ন্ত মুখার্জী
		শ্রী দিব্যেন্দু ব্যানার্জী
		ডঃ পি. কে. ভট্টাচার্য্য
		শ্রী অজয় বিশ্বাস
		শ্রী এ. কে. চন্দ
		শ্রী অমর সরকার

চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটি

গত ১৫ বছরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিনন্দন জানিয়েছে নিম্নলিখিত তালিকা সহ নাম — ১৯৯৯—২০১৩

১৯৯৯	শ্রী বিশেশ্বর চ্যাটার্জী —	প্রসিদ্ধ সমাজসেবী - অবসরপ্রাপ্ত I.P.
	শ্রী পার্থ ঘোষ —	বিখ্যাত স্থপতি।
২০০০	শ্রী এস. জি. বাসু মল্লিক —	প্রাক্তন চেয়ারম্যান, দিল্লী পৌর সাংস্কৃতিক কমিশন।
	শ্রী বিমল ভূষণ চক্রবর্ত্তী -	প্রাক্তন কর্মসচিব, ই. পি, ডি. পি অ্যাসোসিয়েশন্ ও সমাজসেবক।
২০০১	শ্রী সুধীর চন্দ -	রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষক।
	ডঃ ডি. বি. ধর -	সুবিদিত চিকিৎসক।
২০০২	শ্রী ভবেশ সান্যাল -	বিখ্যাত শিল্পী।
	পণ্ডিত দেবু চৌধুরী -	বিখ্যাত সেতার বাদক।
২০০৩	শ্রী ব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য -	শিক্ষা ব্রতী।
	ডাঃ কল্যাণ ব্যানার্জী -	সুবিদিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক।
২০০৪	শ্রী দেবাশিষ বাগচী -	সাহিত্যিক - অবসরপ্রাপ্ত I.P.S.
	ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় -	বিখ্যাত পণ্ডিত।
২০০৫	শ্রী বাল্মিকী ব্যানার্জী -	নৃত্যগুরু ও শিক্ষক।
	ডাঃ আর. এন. আচার্য্য -	সুবিদিত চিকিৎসক ।
	স্বর্গীয় কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য্য -	সঙ্গীত শিল্পী।
২০০৬	শ্রী প্রসন্ন কুমার হোতা -	প্রাক্তন সচিব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয়, সাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ।
	ডাঃ তুহিন কুমার রায় —	সুবিদিত রসায়ণ বিশেষজ্ঞ
২০০৯	শ্রী দিলীপ কুমার বিশ্বাস -	পরিবেশ বিশেষজ্ঞ।
	শ্রী পি. বি. দাস -	প্রসিদ্ধ সমাজ সেবক।

২০০৮	ডাঃ মলয় কুমার চৌধুরী -	শিক্ষাব্রতী ।
	শ্রী নীপেশ তালুকদার -	সুবিদিত সমাজ সেবক।
২০০৯	শ্রী সন্তোষ মোহন দেব -	প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী
	ডাঃ এস. এস. চ্যাটার্জী -	কৃষিবিশেষজ্ঞ ।
২০১০	প্রোঃ বারিদ বরন ভট্টাচার্য্য -	উপাচার্য্য জে. এন. ইউ।
	শ্রী অনন্তবিজয় ভট্টাচার্য্য -	সুবিদিত সমাজ সেবক।
২০১১	শ্রী বিনয় কুমার বসু -	বিশিষ্ট সমাজসেবক।
	শ্রী বিশ্বপতি ঘোষ –	বিশিষ্ট সমাজ সেবক।
	শ্রী সুভাষ কুমার বোস -	বিশিষ্ট সমাজ সেবক।
২০১২	শ্রী এন. এন. সরকার -	সুখ্যাত সমাজ সেবক।
	শ্রী বরুণ কুমার বোস -	প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত।
২০১৩	শ্রী রমেশচন্দ্র চন্দ -	লেখক ও সমাজ সেবক।
	শ্রী আর. পি. বন্দ্যোপাধ্যায় –	শিল্পপতি।
২০১৪	ডঃ আনন্দ মুখার্জী –	প্রাক্তন নিগম পার্ষদ ও সুবিদিত সমাজ সেবক।
	শ্রী অসীম ব্যানার্জী	লেখক ও সুবক্তা

প্রথম কার্য্যনির্বাহক সমিতি ১৯৭৩–৭৪

সভাপতি	–	শ্রী বরুণ চন্দ্র ব্যানার্জী
উপ-সভাপতি গণ	–	শ্রী মন্মথ রঞ্জন চৌধুরী
		শ্রী মাখন লাল সান্যাল
		শ্রী মনোরঞ্জন ভৌমিক
		শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনগুপ্ত
		শ্রী নির্মল চন্দ্র চৌধুরী
সচিব	–	শ্রী জীবনাথ রায়চৌধুরী
যুগ্ম সচিব গণ	–	শ্রী অনিল কৃষ্ণ পাল
		শ্রী জ্যোর্তিময় মিত্র
কোষাধ্যক্ষ	–	শ্রী গুরুপ্রসাদ সেন
সদস্য গণ	–	শ্রী শচী ভূষন ঘোষ
		শ্রী ধ্রুব রঞ্জন দাসগুপ্ত
		শ্রী রামশঙ্কর চক্রবর্তী
		শ্রী সমীর রঞ্জন চন্দ
		শ্রী দেবীপ্রসন্ন আচার্য্য
		শ্রী তারাপদ ভৌমিক
		শ্রী মনীন্দ্র নাথ ঘোষ
		শ্রী হিমাংশু রঞ্জন দাস
		শ্রী সলিল কুমার গুহ
		শ্রী শান্তি রঞ্জন ব্যানার্জী
		শ্রী পীযূষ চন্দ্র ধর
		শ্রী ননীগোপাল বিশ্বাস
		শ্রী তারাপদ বসু মল্লিক
		শ্রী অজিত কুমার গুহ
		শ্রী খগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটি দ্বারা উন্নয়ন মূলক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মায়ের এই বাড়ী শুধুই একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রূপেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, হয়ে উঠেছে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক জীবনের মিলন ক্ষেত্র।

দিন এগিয়ে চলেছে। যাঁরা ছিলেন যুবক তাঁরা বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটির উন্নয়ণমূলক কার্যাবলীও সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে। সকাল সন্ধ্যায় মায়ের মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি মানুষকে আন্দোলিত করে তুলেছে।

সভাপতি ডঃ আনন্দ মুখার্জী ও সচিব ধ্রুবরঞ্জন দাশগুপ্ত – যাঁরা এই মন্দিরের সংগঠনিক কাজে শুরুর দিন থেকে যুক্ত আছেন। বহু প্রতিকুলতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অদম্য উৎসাহ, মনোবল ও ঐকান্তিকতার স্রোত সমভাবে প্রবহমান ছিল।

চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কৃষ্টি, সাহিত্য, শিক্ষা ও লোক সংস্কৃতির সম্প্রসারণ সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিসভা, যোগশিক্ষাকেন্দ্র, মর্নিং ক্লাব, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বাংলা শিক্ষাকেন্দ্র, ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি প্রচারে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি এবং বেদ পরিষদ। এই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি তাদের নিজ নিজ পরিধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারী লাইব্রেরী, শিশুপাঠচক্র, দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, শিশু উদ্যান, নেতাজী সুভাষ হল, ঋষি অরবিন্দ হল এবং চৈতন্য মহাপ্রভু হল প্রভৃতি কালীমন্দির সোসাইটির প্রগতির প্রতীক স্বরূপ বিদ্যমান।

কালীমন্দির প্রাঙ্গণে একদিকে যেমন সকাল সন্ধ্যায় বয়স্ক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের মিলন ক্ষেত্র, অন্যদিকে তেমনই শিশুদের ক্রীড়াঙ্গণ। ১৯৯৬-এর অক্টোবর মাসে একটি সুরম্য শিশু উদ্যান কালীমন্দির প্রাঙ্গণে সংযোজিত হয়েছে।

যোগশিক্ষাকেন্দ্রও যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। এর ফলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছেন। বালানন্দ ধর্মশালার যাত্রীদের সুবিধার জন্য অনেক সুব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রীনিবাসের যাত্রীদের সুবিধার জন্য ওয়াটার ফিল্টার ও ওয়াটার কুলারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাঠকদের সুবিধার জন্য বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার, ঋষি অরবিন্দ হলে স্থানান্তরিত করা

হয়েছে। বাংলা ভাষার যাবতীয় পুস্তক এবং ইংরাজী ভাষার পুস্তকও যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত আছে। বাংলা, ইংরাজী দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রপত্রিকা সম্ভারে পরিপূর্ণ এই গ্রন্থাগার।

অরবিন্দ হলের এই পাঠাগারে শিশু ও কিশোরদের জন্য সংযোজিত, 'শিশু পাঠচক্রে' ১৬ বৎসরের অনুর্দ্ধ বালক- বালিকাদের উপযোগী বই ও পত্র পত্রিকা ইচ্ছামত নিজে নিয়ে পড়ার ব্যবস্থা এবং নামমাত্র বার্ষিক চাঁদায় সদস্য হয়ে, বাড়িতে বই নিয়ে পড়ার সুযোগও আছে।

এছাড়াও নেতাজী সুভাষ হলে বিভিন্ন সভা, সমিতি, আলোচনা বৈঠক, ধর্মসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশিষ্ট গণ্যমান্য ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। সপ্তাহের অধিকাংশ দিনেই এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের অনুষ্ঠান হয়।

কালীমন্দির সোসাইটি দ্বারা দূর্গাপূজা আয়োজিত হওয়ার বহু আগে চিত্তরঞ্জন পার্কে দূর্গাপূজা শুরু হয়েছিল। ১৯৭০ সালে 'কালকাজী পূজা সমিতি' নাম দিয়ে (তখনও কলোনীর কোন নামকরণ হয়নি) প্রথম দূর্গাপূজার মঙ্গলঘট স্থাপিত হয় ও শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় মতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই কলোনীর পূজার প্রবর্তক হিসাবে যাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁরা হলেন প্রয়াত প্রফুল্লকান্ত বসু (বি - ২২৩) ও সুধীর ব্যানার্জী (আই – ১৬৩১)। উভয়েই প্রথম তিন বছর যথাক্রমে সভাপতি ও সচিব ছিলেন। কলোনীর বাসিন্দা না হয়েও যিনি প্রথম বছরের পূজায় নানাভাবে সাহায্যে করেছিলেন, তাঁর নাম প্রয়াত শচীন্দ্রলাল ঘোষ (সাংবাদিক ও সাহিত্যিক)।

১৯৭৩ সালে এই পূজা 'সি' ব্লকে স্থানান্তরিত হয় এবং পূজা সমিতির দ্বিতীয়ে নামকরণ হয় 'চিত্তরঞ্জন পার্ক পূজা সমিতি।' ভারত সরকার ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে কলোনীর নামকরণ করেন।

১৯৭৭ সালে এই পূজা সমিতি, শিবমন্দির প্রাঙ্গণে নতুন বেদী তৈরী করে আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা শুরু করেন এবং ১৯৯২ সাল পর্যন্ত (১৫বছর) চিত্তরঞ্জন পার্ক পূজা সমিতি শিব মন্দিরের পূজামন্ডপে পূজা করেন।

'কালীমন্দির সোসাইটি' ১৯৯৩ সালে প্রথম নিজেদের দায়িত্বে দূর্গাপূজা সম্পন্ন করেন মন্দির প্রাঙ্গণে। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটির দূর্গাপূজার আকর্ষণ যেন সব আকর্ষণকেই ছাড়িয়ে যায়। সেটা তিনদিনই বোঝা যায়। মাতা ভুবনেশ্বরী, রাধাকৃষ্ণ এবং স্বয়ং দেবাদিদেব – এই তিন মনোমুগ্ধকর নয়নলোভন মন্দির প্রদূষণমুক্ত স্বর্গীয় পরিবেশ। এমনটি

আর সমগ্র রাজধানীতে অন্য কোথাও নেই। প্রতিমা থেকে পুরোহিত– এমনকি ঢাকি পর্যন্ত, সবেতেই বাংলার ছোঁয়া।

দূর্গাপূজা ছাড়া অন্যান্য বার্ষিক পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী, শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা ও কালী পূজা বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে নববর্ষের সূর্য্য প্রণাম ও সমবেত বিজয়া সম্মিলনী।

যেসব বাঙালী সন্তানদের অক্লান্ত পরিশ্রম, গভীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ফলে চিত্তরঞ্জন পার্কের আদি দূর্গাপূজা আজ কালীমন্দির প্রাঙ্গণে সুবিশাল রূপ ধারণ করেছে, তাদের অনেকেই আজ লোকান্তর অথবা দেশান্তরে। তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল বাঙালীর প্রতি এবং বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর প্রেম ও অনুরাগ। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই এবং প্রার্থনা করি যেন তাঁদের উত্তরসূরীরা এই দূর্গাপূজার ঐতিহ্য ও কালীমন্দির সোসাইটির ঐতিহ্য বজায় রেখে বছরের পর বছর নির্বিঘ্নে মঙ্গলময়ী মা আনন্দময়ী মায়ের সেবা করে যেতে পারেন সকলের মঙ্গল কামনা করে–

"মা গো আনন্দময়ী মা নিরানন্দ কোরো না"

এবং সকলের মন থেকে মোহ, কালিমা ধুয়ে মুছে দাও–

"তুমি নির্মল করো, মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।"

উপরোক্ত গানের রেশ টেনেই বলি কালীমন্দির সোসাইটি বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতি মূলক কাজও যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছে, তেমনই দেশবরেণ্য মহাপুরুষদের জন্মদিন পালন করে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে আসছে। তাঁদের তালিকায় ঋষি অরবিন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রী শ্রী মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোস, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন।

উপরোক্ত পরমপূজনীয় ব্যক্তিগণের প্রভাব আমাদের, বাঙালীদের মূল্যবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আজকের মহা আধুনিকতার যুগে, যেখানে নতুন প্রজন্ম নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ভুলতে বসেছে, সেখানে কালীমন্দির সোসাইটির প্রতিটি কার্য্যই যে প্রশংসার যোগ্য, সে কথা বলা বাহুল্য। তার মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০ তম জন্মতিথি যেন সমস্ত চিত্তরঞ্জন পার্ক একত্রিত হয়ে পালন করেছেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে। কবিগুরুর কবিতার দ্বারস্থ হতে হয় কবির মহিমা প্রকাশের জন্য–

"আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে ?
আজি হতে শত বর্ষ পরে।"

দেবীতীর্থে দ্বিতীয় ভাগ (১৯৯৯ - ২০১৩)

চল্লিশ বৎসর পূর্বের বাঙালী সমাজ ও চিত্তরঞ্জন পার্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সমস্ত বৃহৎ সৃষ্টির একটা ইতিহাস থাকে। চিত্তরঞ্জন পার্কের বাসিন্দাদের কাছে কালীমন্দির এর প্রতিষ্ঠা বৃহৎ সৃষ্টির থেকে কিছু কম নয়। তাই এই বৃহৎ সৃষ্টির ইতিহাসের কিছু পৃষ্ঠা তুলে ধরতে চাই আপনাদের সম্মুখে।

বাঙালীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে গৌরবোজ্জল স্থান অধিকার করে আছে চিত্তরঞ্জন পার্কের এই কালীমায়ের মন্দির। চিত্তরঞ্জন পার্কের অধিবাসীদের মধ্যে আছে ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও অনুরাগ।

শুরু থেকেই, দিল্লী, বাঙালীর কাছে অতি প্রিয় স্থান। তাই প্রতিনিয়ত যে কোন কারনেই হোক না কেন, ক্রমে বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশবিভাগের দূর্ভাগ্যের পরিণতিরূপে, বাঙালীর সংখ্যা বিপুল আকার ধারণ করলো। সমস্ত ক্ষেত্রের প্রতিভাশালী নারীপুরুষের সমাগম হল, চিত্তরঞ্জন পার্কে।

বাঙালী মানেই আতিথেয়তা আপ্যায়ন। কোন পরিস্থিতিতেই বাঙালীরা পিছিয়ে থাকেন না। তাই দিল্লী প্রবাসী বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বন, বিভিন্ন সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, আচারবিচার, আহার বিহার, বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করলো।

দিল্লীর বৃহত্তম বাঙালী উপনিবেশ, চিত্তরঞ্জন পার্ক আজ সর্বজনবিদিত।চিত্তরঞ্জন পার্কে যেমন বাঙালীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজলভ্য হয়ে উঠলো তেমনই এখানকার বাসিন্দাগণ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন, মন্দির নির্মানের কাজে। সর্বশ্রী ঁজীবনাথ রায় চৌধুরী (বি-১৬২), ঁফনিভূষণ দাস (বি-২৬৫) এবং ঁঅনিলরঞ্জন দত্ত (জি ১৪১৬) এই তিন বন্ধুর মনে, মন্দির স্থাপনের ইচ্ছা প্রথম দানা বাঁধে। তখন এই বাঙালী উপনিবেশের পথঘাট ছিল বন্ধুর, ছিল কন্টকাকীর্ণ । কিন্তু তাঁরা এগিয়ে গেছেন নির্দ্বিধায়, রবি ঠাকুরের সেই গানের সঙ্গে—

“আমি ভয় করবোনা ভয় করবোনা”

তাঁদের সেই অদৃশ্য ইচ্ছা ও প্রচেষ্ঠা, ধীরে ধীরে মন্দির নির্মাণের পথ মসৃণ করে তুললো। এঁদের প্রচেষ্টায়, চিত্তরঞ্জন পার্কের অধিবাসী ঁশ্রী মন্মথ রঞ্জন চৌধুরী মহাশয়ের গৃহ-

শ্যামশ্রীতে (আই - ১৬১৪), বিশজন অধিবাসীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে মন্দির স্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয়। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার সূচনা ২১শে জানুয়ারী ১৯৭৩ সালে হয়। সেই সূচনা লগ্নে যাঁরা ছিলেন এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ, আজকের এই কালীমন্দির, এই মায়ের সুসজ্জিত গৃহ – যাঁর সামনে এসে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই মায়ের আরাধনা করেন। কালীমন্দিরকে, বাঙালী সাধারণত কালীমন্দির বলেন না, বলেন– কালীবাড়ী। "মন্দির" শব্দটি যেন মানুষ ও দেবতার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। আর "বাড়ি" শব্দটি একান্ত আপন। মায়ের বাড়ি। এর থেকে বড় আশ্রয় আর কি আছে মানুষের কাছে ? মঙ্গলময়ী, আনন্দময়ী মার কাছে ভক্তের তাই আকুল প্রার্থনা শোনা যায় এই গানে—

"আমি সব ছেড়ে মা ধরবো তোমার রাঙাচরণ দুটি
এই তো আমার ব্রত।"

রজত জয়ন্তী উৎসব - ১৯৭৩ - ১৯৯৮

কালীমন্দির সোসাইটির দুই সন্ধিক্ষনে রজতজয়ন্তী উৎসব পালন করেছে। অনেক বাধা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে আগের পঁচিশবছর ছিল কন্টকাকীর্ণ। তথাপি সোসাইটির সভ্যদের মনোবল ছিল গভীর। তাদের লক্ষ্য ছিল অটুট। আমরা আজ কিছুটা আত্মতৃপ্ত, কেননা আমাদের আশা আজ অনেকাংশেই পূরণ হয়েছে। পঁচিশ থেকে চল্লিশ, এযেন যৌবন অতিক্রম করে জীবনের একটা স্থির সিদ্ধান্তর পথে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু মায়ের ভক্তদের আশা আশাঙ্খা অনেক, আমাদের তাই চুপ করে বসে থাকার সময় নেই। চরৈবতি-চরৈবতি, জীবন মানে থেমে থাকা নয় – এগিয়ে যাওয়া সবাইকে নিয়ে। "তাই মোরা মিলেছি আবার মায়ের ডাকে"।

২১শে এবং ২২শে নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে ২ দিন ব্যাপী সোসাইটির রজত জয়ন্তী উৎসব পালন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জনপ্রিয় "উদ্বোধন" পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীমৎস্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ, বেলুড় মঠের শ্রীমৎস্বামী প্রভানন্দ মহারাজ এবং দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শ্রীমৎস্বামী গোকুলানন্দ মহারাজ, এই উৎসবে উপস্থিত থেকে আমাদের গৌরবান্বিত করেছেন।

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

বাঁদিক থেকে ঃ ডঃ আনন্দ মুখার্জী, শ্রীমৎস্বামী গোকুলানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎস্বামী পূর্নাত্মানন্দ মহারাজ, ধ্রুব দাশগুপ্ত, নৃত্যেন্দ্রনাথ সরকার, বিশ্বপতি ঘোষ

পূজ্যপাদ মহারাজগণের সারগর্ভ ভাষণ এবং সুপ্রসিদ্ধ গায়ক প্রফেসর রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত সমবেত জনগণকে ভক্তিতে আপ্লুত করেছিল। রজত জয়ন্তী উৎসবের সময়, স্মরণিকা পুস্তক "দেবীতীর্থে" প্রকশিত হয়।

১৯৯৯ এর ফেব্রুয়ারী মাসে Agri Horticulture Society, Pusa আয়োজিত প্রতিযোগীতায়, কালীমন্দিরের উদ্যান দিল্লীর সর্বোৎকৃষ্ট উদ্যানের জন্য ট্রফি এবং সার্টিফিকেট লাভ করে।

২৪শে আগষ্ট ২০০০ তারিখে মন্দির প্রাঙ্গণে কোলকাতা হাইকোর্ট এ্যাডভোকেট ড্রামা এ্যাসোসিয়েশন প্রয়োজিত "নটী বিনোদিনী" নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের ভূমিকায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অজিত পাঁজার অভিনয় উপস্থিত দর্শকবৃন্দের থেকে অভূতপূর্ব প্রশংসা পেয়েছিল। Wide Screen CC TV-র সুবিধা থাকায়, অগণিত দর্শক এই নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছিল। Cable Operator এর সাহায্যে, চিত্তরঞ্জন পার্ক এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারাও TV দ্বারা এই নাটকটি দেখার সুযোগ পেয়েছিল

চল্লিশ বৎসর পূর্ত্তির সন্ধ্যা

রজত জয়ন্তী উৎসবের সময় (১৯৯৮) Dr. Ananda Mukherjee কালীমন্দির সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। এর পরের পনের বছর তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে মন্দির উন্নতির কার্য্যের সাথে জড়িত আছেন। বর্ত্তমানে তিনি সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা।

১৬ই নভেম্বর, ২০১৩ সন্ধ্যায় কালীমন্দির প্রাঙ্গনে সোসাইটির চল্লিশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে ডঃ আনন্দ মুখার্জী প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ :—

মাননীয় সভাপতি শ্রী নৃত্যেন্দ্রনাথ সরকার, সচিব শ্রী শান্তি মজুমদার এবং সমবেত সুধীমন্ডলী –

Silver Jubilee বা Golden Jubilee পালন করার রীতি রেওয়াজ আছে, তবে চল্লিশ বছরে Ruby Jubilee পালন করার নজীর মেলে না। আমরা সবসময় একটু নতুন কিছু করবার চেষ্টা করি, যেমন পয়লা বৈশাখে সূর্য্য প্রণাম, সদস্য দিবস, শিশু দিবস, দরিদ্র নারায়ণ সেবা ইত্যাদি। তবে Ruby Jubilee পালন মূলতঃ সম্ভব হয়েছে, মুম্বাইবাসী ভারতখ্যাত শিল্পী শেখর সেনের অনবদ্য অভিনয় "তুলসীদাস" নাটক মঞ্চস্থ করা উপলক্ষ্যে যা আপনাদের গতকাল (১৫ই নভেম্বর) সন্ধ্যায় দেখার সুযোগ হয়েছিল।

১৯৯৮র নভেম্বর মাসে আমরা Silver Jubilee (রজত জয়ন্তী) ধূমধামের সাথে পালন করেছিলাম যা আপনাদের মনে আছে। "দেবী তীর্থে" নামে এক স্মরণিকা পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম পঁচিশ বছরের ইতিহাস এক সুখদুঃখের ইতিহাস। আশা নিরাশার ইতিহাস এবং সংগ্রামের ইতিহাস। একটুকরো জমির উপর একটা টিনের চালের নীচে শিব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা, লোকের দরজায় দরজায় গিয়ে অর্থ ভিক্ষা। আমাদের পূর্বসুরীরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করে যে ভিত বানিয়েছিলেন তার উপর আজকের তিনটি মন্দির শোভা পাচ্ছে। সেদিন আশা ছিল কিন্তু ভরসা ছিল না। সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না। আজ সম্মিলিত প্রয়াসে সব সম্ভব হয়েছে।

গত পনের বছরের ইতিহাস Consolidation ও সৌন্দর্য্য করণের ইতিহাস। এর আগে আমরা মন্দিরগুলো স্থাপনা করেছি। কিন্তু লেখালেখি করা সত্ত্বেও মালিকানা ছিল না। দেখা করেছিলাম South Delhi M.P. শ্রীমতী সুষমা স্বরাজর ও তদানীতণ Urban Development Minister এবং নামকরা Lawyer শ্রী জেঠমালানির সঙ্গে। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা DDAতে আবেদন করে ১. ৭০ একর জমি পাই। এ সময় জমির দাম ছিল একর প্রতি প্রায় আশি লাখ টাকা। তবে অনুনয় বিনয় করে এবং সুষমাজী ও বিজয়জীর (বিজয় কুমার মালহোত্রা) চেষ্টায় ১৯৭৩ তে আমরা যখন প্রথম apply করেছিলাম সে সময়কার rate one lakh per acre

এ DDA আমাদের জমি দিয়েছিল। 27th March 2001 এ আমরা ২ লাখ টাকা জমা দিয়ে জমির মালিকানা পাই Perpetual Lease - hold basis এ। বাকী দুই একরের জন্য তখনকার rate এ দুই কোটী টাকা দেবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। এই সময় তদানীন্তন DDA-র vice Chairman, Shri P. C. Hota আমাদের সাহায্য করেন একটা নতুন উপায়ের মাধ্যমে। সর্ত্ত ছিল বাকী জমি সদাসবুজ থাকবে। আমাদের এটা খুব ভাল লেগেছিল। তাই 3rd September 2002 থেকে বাকী জমির জন্য আমরা ২৮ হাজার টাকা দরে, Annual Licence Fee দিয়ে আসছি। এ সময় আমরা নতুন করে ভোজনালয় ও শৌচাগার তৈরী করি, কেননা এগুলো খুবই শোচনীয় অবস্থায় ছিল।

জমির মালিকানার পর আমরা মন্দিরের সৌন্দর্য্যকরণের দিকে নজর দিই। আমাদের বন্ধু Architect পার্থ ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শে, টেরাকোটা দিয়ে মন্দির সাজানোর সিদ্ধান্ত নিই। কলকাতা থেকে পাঁচজন শিল্পীকে যোগাযোগ করা হয়। এদের মধ্যে দুইজন শিল্পী শ্রী মলয় দত্ত ও শ্রী বিশ্বজিৎ মজুমদার দিল্লি আসেন।

শেষপর্য্যন্ত বিশ্বজিৎকে আমরা পছন্দ করি। ও কৃষ্ণনগরের ছেলে এবং ওর কাজে সৃজনশীলতার ছাপ আছে। সকলেই ওর কাজের প্রশংসা করেন। এখন আমরা মন্দিরগুলোর বাইরের দিক সাজিয়ে তুলছি। আমরা মনে করি এ কাজগুলো আপনাদের ভাল লাগছে।

এ ছাড়া অবন্তিকা শিশু উদ্যানের নবীকরণ, আমাদের সদস্য ও উদীয়মান Architect শ্রী নীলাঞ্জন ভাওয়ালের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

শ্রীমৎস্বামী শ্রীশ্রী মোহনানন্দজী মহারাজ, যাঁর অনুদানে আমাদের শ্রীশ্রী বালানন্দ তীর্থাশ্রম যাত্রী নিবাস ধর্মশালা তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, তাঁর নামে এক সন্তঘর করার ইচ্ছাও বহুকাল বাদে রূপ নিয়েছে। এই কাজে মোহনানন্দ ট্রাষ্ট আমাদের সাহায্য করেছেন। মনে রাখতে হবে এই ধর্মশালা আমাদের perpetual ভিক্ষাপাত্র থেকে নিস্কৃতি দিয়েছে।

এ বছর আমাদের মুখ্য কাজের মধ্যে ছিল গীতিময় ঝর্নাধারা,- এটা সম্ভব হয়েছে শ্রী পার্থ দে মহাশয়ের সাহায্যে – তিনি কলকাতার Golden Trust এর মাধ্যমে আমাদের চল্লিশ লাখ টাকা অনুদান দেবার ফলে কাজটা সম্ভব হয়েছিল। আপনারা জানেন, গত ফেব্রুয়ারী মাসে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের কন্যা ডঃ অনিতা বোস প্যাফ এটা শুভারম্ভ করেছিলেন।

গীতিময় ঝর্নাধারা

ঝর্নাধারার উদ্বোধনে
শ্রীমতি অনিতা বোস
প্যাফ ও
ডঃ আনন্দ মুখার্জী

মন্দির, পূজাপার্বন ছাড়াও, এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বাংলা দেশের নামকরা শিল্পীদের নিত্য যাতায়াত এখানে। ঁঅজিত পাঁজা মহাশয়ের নাটক, "নটী বিনোদিনী" আজও সকলে স্মরণ করেন।

প্রতি ফেব্রুয়ারী মাসে "Members Day" - Informal Get Together with Pakora, Hot Coffee এক বিশেষ আকর্ষণ। প্রতি Life Member কে তাদের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তাদের নামে পূজো করে মায়ের প্রসাদ ও জন্মদিনের কার্ড তাদের বাড়ীতে পাঠানো হয়। এ ছাড়া রথযাত্রা, পুস্প প্রদর্শণী, সন্ধ্যাবেলা আলোকের ঝর্নাধারার রবীন্দ্রসংগীত, মন্দির প্রাঙ্গনকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। দুর্গাপূজার চেহারা দিন দিন পাল্টাচ্ছে। গত বছর দমদম থেকে এক ভদ্রমহিলা মন্দিরের পূজা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তার লেখা চিঠিটা এবার পূজা Souvenir এ আছে। আপনারা নিশ্চয় পড়বেন।

সদস্য দিবস উৎসব

চিত্তরঞ্জন পার্কে, অনেক পরিবারের ছেলেমেয়েরা চাকরীসূত্রে বিদেশে থাকে। এদের বয়স্ক পিতামাতারা অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কেউ নেই। কালী মন্দির থেকে আমরা একটি "সহায়তা সংস্থা" তৈরী করেছি, যার নাম "Netaji Subhas Brigade"। এরা প্রস্তুত প্রয়োজনে সাহায্য করবার জন্য।

পরিশেষে প্রথম Managing Committeeর, যে ছয় জন আমাদের মধ্যে এখনও আছেন, তাঁরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আজ আমরা তাঁদের সম্মানিত করবো। এরা হলেনঃ–

১) শ্রী রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তী
২) শ্রী শান্তিরঞ্জন ব্যানার্জী
৩) শ্রী শচিভূষণ ঘোষ
৪) শ্রী হিমাংশু রঞ্জন দাস
৫) শ্রী অজিত কুমার গুহ
৬) শ্রী জ্যোতির্ময় মিত্র

এদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আপনারা করতালি দিয়ে এদের অভিনন্দন করুন।

আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ঃ

১) Auditorium ২) ধর্মশালার সম্প্রসারণ ৩) টেরাকোটা কাজ শেষ করা।

দেবদেবীদের প্রণাম জানিয়ে এবং আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মন্দির গাত্রে টেরাকোটা শিল্পের কারুকার্য

বাংলার টেরাকোটা কাজ শিল্পনিদর্শনের এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের আকর। অনেকেই হয়তো অবগত নন যে বিখ্যাত শ্রীমতি কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, যখন জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতের হস্তশিল্প বিষয়ে All India-র Handicafts Board এর Chairman ছিলেন তখন বাঁকুড়ার ঘোড়া Central Cottage Industries এর Motif হয় এবং এখনও তাই আছে। এই প্রসঙ্গে বলি কমলাদেবী ছিলেন এক দক্ষিণী মহিলা, যিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন সরোজিনি নাইডুর ভাই শ্রী হারিন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা শিল্পের এক অপরূপ নিদর্শন। ভারতবর্ষে অনেকেরই জানা নেই যে বর্তমান বাংলাদেশের পর্য্যটন বিভাগ দিনাজপুরের কান্তজী মন্দিরটিকে ঐ দেশের পর্য্যটক আকর্ষনের এক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নিয়মিত প্রচার করে থাকে। এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের মন্দিরের আদলেই তৈরী হয়েছিল প্রায় দুশ বছর পূর্বে। যাই হোক, চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির বাংলার ভাস্কর্য্যের এক উজ্জল প্রতিভূ হয়ে উঠবে এ কথা প্রতিষ্ঠাতাদের মনে থাকলেও বিভিন্ন প্রতিকূলতায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মন্দিরের টেরাকোটা কাজের পেছনে একটা ছোট ইতিহাস আছে। এই প্রসঙ্গে মন্দিরের তদানীন্তন সচিব ডঃ আনন্দ মুখার্জীর ভাষাতেই বলি– "১৯৯৭ সালে যখন মন্দিরের Secretary ছিলাম, তখন একদিন সকালে খবর পেলাম যে মন্দিরে দুই Truck মার্বেল পাথর এসেছে। কে পাঠিয়েছে সে সম্বন্ধে খবর নিতে গিয়ে শুনি, আমাদের কমিটির একজন "বিশেষ উৎসাহী" বন্ধুর প্রচেষ্টায় Allahabad Bank এর তৎকালীন ম্যানেজারের সৌজন্যে ঐ পাথর এসেছে। উদ্দেশ্য মন্দিরের চূড়া পাথর দিয়ে মোড়া হোক। আশ্চর্য হলাম এই কারণে যে এই ব্যাপারে মন্দিরে কোন আলোচনা হয় নি। বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। কমিটির সভ্যদের মতামত কিন্তু ভিন্ন। আমি তখন আমাদের Architect স্বনামধন্য শ্রী পার্থ ঘোষ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলাম– কী করা উচিত। উনি কোনমতেই সম্মত হলেন না। বললেন পাথর দিয়ে মসজিদ বা গুরুদোয়ারার গম্বুজ মোড়া হয়। কিন্তু বাঙালীদের মন্দিরের চূড়া কখনও পাথর দিয়ে মোড়া হয় না। আমি যদি এ কাজ করি তবে আমি মন্দিরের সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য কম করব যার জন্য কেউ আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। ইতিমধ্যে Lotus Temple মন্দিরের কাজ যে সংস্থা করেছিল, Larsen & Tubro-তাদের আমাদের বন্ধুবর ভেবেছিলেন এবং শিবমন্দিরের মাপ নেওয়া শুরু হয়েছিল। এই কাজ স্থগিত করার জন্য আমার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটল। পার্থবাবু উপদেশ দিলেন যদি কখনও মন্দিরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিকরণ হয়, তাহলে যেন টেরাকোটা দিয়ে মন্দির আচ্ছাদিত করি।

ইতিমধ্যে আমার সমাজসেবা সংস্থা, হস্তকলার উপর কিছু কাজ পেল। এই উপলক্ষ্যে কোলকাতায় হস্ত কলাশিল্পের একটি প্রদর্শনী চলছিল। আয়োজকদের অনুরোধে এই প্রদর্শনীতে

গিয়ে টেরাকোটা শিল্পীদের সাথে পরিচয় হয় এবং পাঁচজনকে অনুরোধ করি আমাদের মন্দিরে এসে আমাদোর মন্দির দেখে আমাদের মনোনীত Theme অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করতে। সঙ্গত কারণেই এদের দিল্লী যাতায়াতের খরচ এবং দিল্লীতে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা (আমাদের যাত্রীনিবাসে) আমরা বহন করেছিলাম। দুজন এসেছিল– শ্রী বিশ্বজিৎ মজুমদার ও শ্রী মলয় দত্ত। মলয় দত্ত বারাসাতের ও বিশ্বজিৎ মজুমদার কৃষ্ণনগরের। বিশ্বজিতের কাজে কৃষ্ণনগরের ছাপ ছিল– খুব পরিস্কার কাজ। তাই বিশ্বজিৎ মজুমদারকেই আমরা নিযুক্ত করলাম।

বিশ্বজিতের কাজের মধ্যে "মহাপ্রস্থানের পথে" দৃশ্যটি অভিনব। সেটি আমাদের কালীমন্দিরের গর্ভগৃহের পিছনদিকে সংযোজিত হয়েছে। কাজটা কৃষ্ণনগরের Studio তে যখন তৈরী হয় তখন আমি কয়েকবার গিয়ে দেখে এসেছি। এই কাজের উৎকর্ষতা বিশেষ প্রশংসনীয়। এর পরে শিবমন্দিরে, শিবের প্রলয় নৃত্য ও রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে দশাবতার, ননীচুরি এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিমূর্তি মানুষকে হতবাক করে।

টেরাকোটা শিল্পের দ্বারা মন্দির সৌন্দর্য্যকরণ

সন্ত কুটির

মন্দির গাত্রে টেরাকোটা শিল্পের কারুকার্য্য যেমন মানুষকে হতবাক করে তেমনই "মোহন সন্ত কুটির" এর দ্বার উন্মোচন ও একটি বিশেষ রমণীয় কীর্তি বলে পরিগণিত হয়েছে সবার কাছে।

চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দিরের ইতিহাসে, ২রা আশ্বিন ১৪১৯ (১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১২) শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি বুধবার, একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৮৫ সালে শ্রীশ্রী মোহনানন্দ মহারাজ যখন শ্রীশ্রী কালীমাতার চক্ষুদান করেছিলেন তখন বলেছিলেন একদিন এই মন্দির পীঠস্থান হয়ে উঠবে। সেই সময় মন্দির কর্তৃপক্ষের প্রার্থনাতে, শ্রীশ্রী মোহনানন্দ মহারাজ, দিল্লীর মোহনানন্দ সংঘের সচিবকে বলেছিলেন মন্দিরকে পাঁচলক্ষ টাকা অনুদান দিতে- যার ফলস্বরূপ বালানন্দ ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্মশালা একদিন যেমন শত শত বাঙালী যাত্রীদের অল্প খরচে দিল্লীতে সাময়িক আবাসের সুবিধা করেছে তেমনই এর অর্থে মন্দিরের পুজার কাজ এবং পুরোহিত ও সেবাদারদের পারিশ্রমিক এবং উদ্যানরক্ষার ব্যয়ভারও বহন করার সহায়ক হয়েছে।

মোহনানন্দ সংঘের সভ্যদের আকাঙ্খা ছিল যে কালীমন্দির প্রাঙ্গণে একটি সন্তকুটির যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কালীমন্দির সোসাইটি সম্মত হন। তবে বিভিন্ন প্রতিকূলতায়, সন্ত কুটির নির্মাণের কাজ প্রারম্ভ করতে সময় লেগে যায়। অবশেষে ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১২ (২রা আশ্বিন, ১৪১৯) তারিখে গণেশ চতুর্থীর পুণ্য দিবসে "মোহন সন্ত কুটির" এর দ্বার উন্মোচন শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ এবং তাঁর অগণিত শিষ্য সেবক বৃন্দের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়।

মোহনানন্দ সংঘের সভাপতির ভাষায় "বিরাট একটি প্রাসাদের বদলে পবিত্র কালীবাড়ীর এইটুকু নিরিবিলি জায়গায়, মহারাজের শিষ্য ভক্তদের সঞ্চিত অর্থে, তৈরী এই 'সন্ত কুটির' টুকু পেয়েই মহারাজের শিষ্য ভক্তরা পরিতৃপ্ত।"

গীতিময় আলোকের ঝর্ণাধারা

কালীমন্দির সোসাইটির রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হল ১৯৯৮ সালে। প্রথম পঁচিশ বছর অনেক কঠিন পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে চলতে হয়েছে। কিন্তু মন্দির কমিটির সৌন্দর্যীকরণ, কমিটির কার্য্যনির্বাহকদের মনে সর্বদাই ছিল এবং আছে। সামনের দিকে মন্দির মালঞ্চ তৈরী করা এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ। আগে দূর্গাপুজার সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গুলোর জন্য একটি স্থায়ী, Stage তৈরী করা ছিল। মন্দির মালঞ্চ প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত না করবার জন্য কয়েক বছর আগে এই Stage টিকে পিছনদিকে সরিয়ে নেওয়া হয়। Stage এর জায়গাটির সদ্ ব্যবহারের কথা আমরা ভাবছিলাম। এমন সময় গোল্ডেন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট নামে এক সংস্থা আমাদের প্রস্তাব দেয় ঐ জায়গাটিতে একটি ঝর্ণাধারা স্থাপন করবার জন্য। এ ব্যাপারে সব খরচই ঐ দাতব্য সংস্থা বহন করবে। আমরা এই সুযোগ সানন্দে গ্রহণ করি।

ঈশ্বরের কৃপায় ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সালে, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতি অনিতা প্যাফ ভারতে আসেন এবং আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ৮ই ফেব্রুয়ারী এই ঝর্ণাধারা উন্মোচন করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তৃতায় তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথাও উল্লেখ করেন। বলা বাহুল্য উপস্থিত দর্শক শ্রোতা এতে মন্ত্রমুগ্ধ হন।

নানাবর্নের আলোকময় ঝর্নাধারা

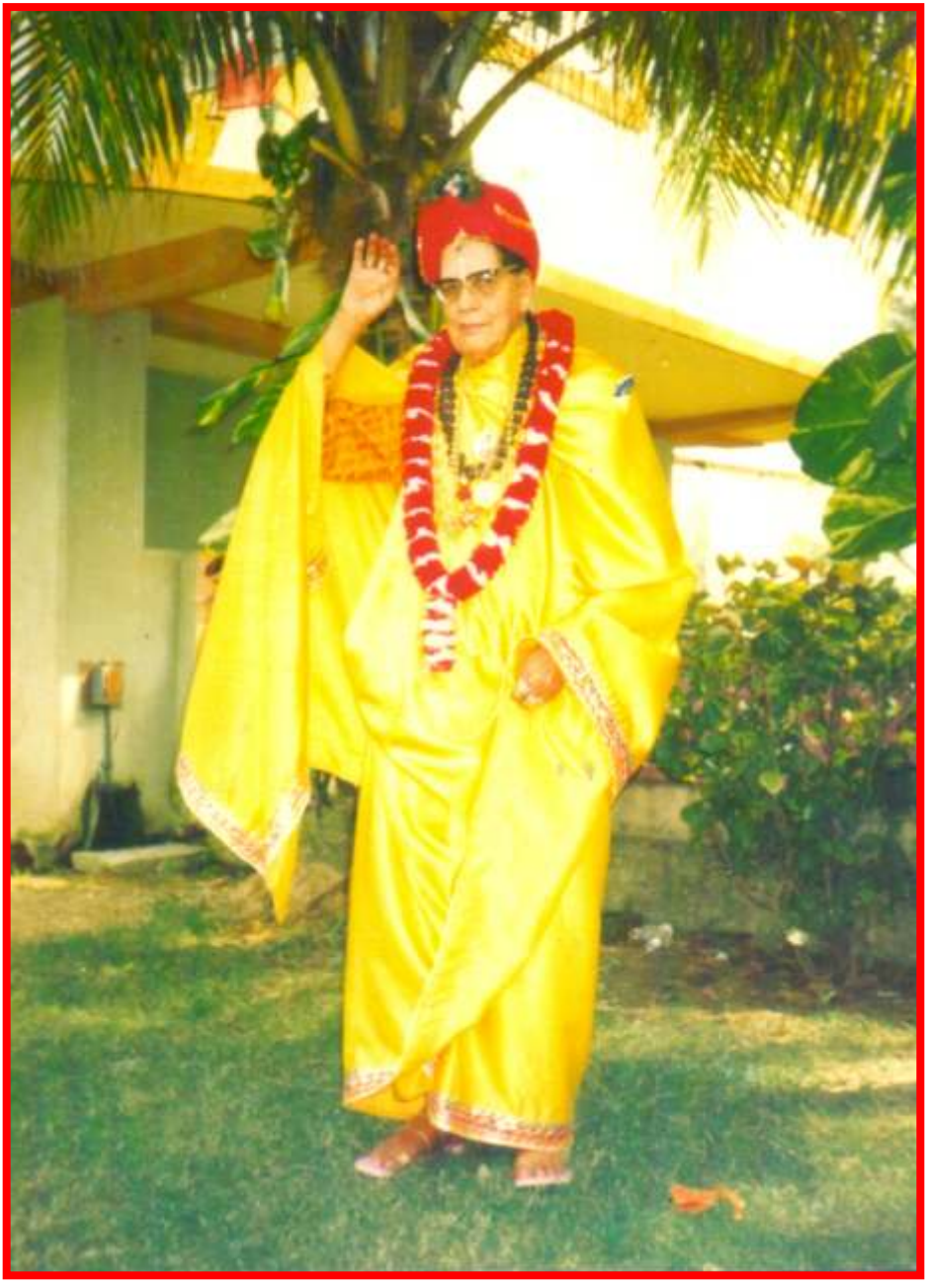

শ্রীমৎ স্বামী
শ্রী শ্রী মোহনানন্দ মহারাজ

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির শতবর্ষ

১৩ই নভেম্বর, ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলী নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল—

গীতাঞ্জলি থেকে ঃ

মনে করি এইখানে শেষ –
কোথা বা হয় শেষ।
আবার তোমার সভা থেকে
আসে যে আদেশ।
নূতন গানে নূতন রাগে
নূতন ক'রে হৃদয় জাগে ,
সুরের পথে কোথা যে যাই
না পাই সে উদ্দেশ।
সন্ধ্যাবেলার সোনার আভায়
মিলিয়ে নিয়ে তান
পূরবীতে শেষ করেছি
যখন আমার গান –
নিশীথরাতের গভীর সুরে
আবার জীবন উঠে পূরে,
তখন আমার নয়নে আর
রয় না নিদ্রালেশ।